বাংলাদেশ
জার্নাল
অব
পলিটিক্যাল
ইকোনমি

© ২০২২ বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি
খণ্ড ২, সংখ্যা ১, ডিসেম্বর ২০২২, পৃষ্ঠা, ১৬৯-১৭৮
বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি
(আইএসএসএন ২২২৭-৩১৮২)

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠনে বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক ভাবনা

বিশ্বাস শাহিন আহম্মদ*

সারসংক্ষেপ *স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন স্বয়ং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনায়, কর্মে ও হৃদয়ে এ বিষয়টি সদা জাগ্রত ছিল। এ দেশকে 'সোনার বাংলা' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছা। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সতীর্থরা বুঝতে পেরেছিলেন এ দুর্দশার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন; সেটি রুখতে হবে এবং অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও তখনকার বাঙালিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আমাদের মাটি, পানি, আমাদের সব সম্পদ আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারব। আমাদের সবই আছে, কিন্তু কীভাবে এগুলো কাজে লাগাব—এ প্রশ্ন থেকেই পরিকল্পনার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মাথায় আসে। সদ্য স্বাধীন দেশটির একটি অন্যতম প্রয়োজন ছিল এর অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি দিগ্‌দর্শন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। দেশের বরেণ্য একদল অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞ ও অত্যন্ত মেধাবী ও অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মকর্তা এ কমিশনে যোগ দেন। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এ কমিশনের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বাংলাদেশেন প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, তাদের দেওয়া সম্মানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে এ কমিশন ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো এ পরিকল্পনা গ্রন্থটিও এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক দলিল। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্বই শুধু তুলে ধরা হয়নি, বরং এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হবে, সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রফেসর নুরুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত এ পরিকল্পনা দলিলের ভূমিকাটি একটি অনন্যসাধারণ রচনা, যা আজও এ দেশে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ। বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনায় মোটা দাগে দুটি বিষয় চেয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলার দুঃখী মানুষ খেয়েপরে বাঁচুক। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরাই বাংলাদেশ শাসন করুক। স্ব-ভূমিতে চিরতরে বিদেশি শাসনের অবসান ঘটুক। তাঁর দুটি লক্ষ্যই প্রায় অর্জিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে আমরা একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি। এই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ২০৪৬ সালে স্বাধীনতার*

* সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি, প্রেষণে বিদ্যালয় পরিদর্শক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, যশোর

হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে 'উন্নত রাষ্ট্রে' পরিণত করা, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং ২১০০ সালে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সকল সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে সুরক্ষিত করাই হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন। বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন আমাদের দেখিয়েজেন তা অবশ্যই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব।

ভূমিকা

স্বাধীন বাংলাদেশ বিনির্মাণের ভাবনা, চিন্তা, রূপরেখা ও কর্মপরিকল্পনা সাজিয়েছিলেন স্বয়ং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধুর চিন্তা, চেতনায়, কর্মে ও হৃদয়ে এ বিষয়টি সবসময় জাগ্রত ছিল। এ দেশকে 'সোনার বাংলা' রূপে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশ রাষ্ট্র হওয়ার পেছনে আরেকটি প্রধান চালিকাশক্তি ছিল ব্যাপক জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির ইচ্ছা। ঐতিহাসিকভাবেই আমরা শোষিত, বঞ্চিত ও অবহেলিত ছিলাম। বঙ্গবন্ধু ও তাঁর রাজনৈতিক সতীর্থ ও দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবীরা বুঝতে পেরেছিলেন এ দুদর্শার প্রধান কারণ ঔপনিবেশিক লুণ্ঠন; অর্থনৈতিক মুক্তি আনতে হলে সেটি রুখতে হবে। বঙ্গবন্ধু ও তখনকার বাঙালিরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে আমাদের মাটি, পানি, আমাদের সব সম্পদ আমাদের হাতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাহলেই কেবল আমরা অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে পারব। আমাদের সবই আছে, কিন্তু কীভাবে এগুলো কাজে লাগাব—এ প্রশ্ন থেকেই পরিকল্পনার বিষয়টি বঙ্গবন্ধুর মাথায় আসে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার বেশ আগে থেকেই বঙ্গবন্ধুর লেখনিতে এবং বক্তৃতায় বহুবার 'সোনার বাংলা' শব্দগুচ্ছের ব্যবহার দেখা যায়। তিনি সবসময়ই 'সোনার বাংলার' গৌরব পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ভেবেছেন এবং সে মতো কাজও করেছেন। সোনার বাংলা তাঁর কাছে নিছক কোনো রাজনৈতিক 'বুলি' ছিল না। এই ভূখণ্ডের অতীত গৌরবের ইতিহাস সম্পর্কে খুবই সচেতন ছিলেন বঙ্গবন্ধু। অষ্টাদশ শতাব্দীতে এ অঞ্চলের মানুষের জীবনমান গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের জীবনমানের সমতুল্য ছিল। বঙ্গবন্ধু এই গৌরবময় অতীত সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তির লক্ষ্যে যথাযথ সংগ্রামের মাধ্যমে অতীতের সেই গৌরবময় অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। আর তাই স্বাধীনতার বহু বছর আগেই তিনি তাঁর রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সংগ্রাম শুরু করেছিলেন এবং তাঁর জীবদ্দশায় তা বাস্তবায়ন করে দেখিয়েছিলেন।

অবাস্তব রাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকেই একচোখা পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাংলাদেশকে (তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানকে) ঠকিয়েছে এবং শোষণও করেছে। এই শোষণ ও বৈষম্যের বিষয়ে বঙ্গবন্ধু ছিলেন সদা সচেতন। তিনি অনুধাবন করেছিলেন যে এই বৈষম্যের রাজনৈতিক ও সামাজিক মাত্রার পাশাপাশি অর্থনৈতিক মাত্রাও ছিল। ১৯৫৩ থেকে ১৯৫৬ সময়কালে পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছিল, অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্থানে ৪৭টি বৃহৎ শিল্প ইউনিটের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ২ কোটি টাকা। পূর্ব পাকিস্তানে কৃষির অধিকতর বিকাশের সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষিখাতের উন্নয়নের জন্য বেশি পরিমাণে বরাদ্দ দিয়েছিল। বাংলাদেশের (তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান) কৃষকেরা অতি উন্নতমানের পাট উৎপাদন করত। অথচ এই পাট ও পাটজাত পণ্য রপ্তানি থেকে, যা আয় হতো তার শতকরা ৯০ ভাগই

ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানের আমদানি ব্যয় মেটানোর জন্য। পাকিস্তানে তখন চলছে কতিপয় পরিবারতন্ত্র। প্রায় সব ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ছিল ২২টি পরিবারের হাতে। আর পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন নিয়ে ওই পরিবারতন্ত্রের সমর্থক কেন্দ্রীয় শাসকেরা মোটেও ভাবত না।

বঙ্গবন্ধু এই ভয়াবহ বৈষম্যমূলক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে এ দেশের দুঃখী মানুষের ভাগ্যের উন্নয়নে ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। তিনি ছিলেন দুঃখী মানুষের বন্ধু। তিনি সবসময় দুঃখী মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাইতেন। আর তাই তিনি এ অধিকার আদায় করতে গিয়ে বারবার জেল খেটেছেন, অসীম ত্যাগ স্বীকার করেছেন, কিন্তু দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফুটানোর ক্ষেত্রে কখনো বিন্দুমাত্র পিছপা হননি। তাই তিনি যখন পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকারের শিল্প মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেলেন, তখন সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছেন এ দেশের শিল্প বিকাশের পরিবেশ নিশ্চিত করতে। বঙ্গবন্ধুর প্রস্তাবনা অনুসারে ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি থেকে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব এ দেশীয় কর্তৃপক্ষের হাতে আসার কথা। পূর্বের প্রতি পশ্চিমের বৈষম্যের সূত্রগুলো খুঁজে বের করার জন্য তিনি একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনের প্রস্তাবও করেছিলেন। তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ একটি অর্থনৈতিক কমিশন গঠনও করেছিল। সেই ভাবনা থেকেই দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই একঝাঁক দেশপ্রেমিক, নিবেদিতপ্রাণ অর্থনীতিবিদ নিয়ে গঠন করলেন বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন।

পাকিস্তানের দুই অংশে যে দুটো অর্থনীতি বিরাজমান, এই ধারণা প্রথম তোলা হয় ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬০) জন্য উন্নয়ন কৌশল তৈরির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক অর্থনীতিবিদেরা ১৯৫৬ সালের ২৪-২৮ আগস্ট একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক এবং পরিকল্পনা বোর্ডের অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, পাকিস্তানকে একটি 'দুই অর্থনীতির' দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। আর তখন থেকেই দুই অর্থনীতির তত্ত্ব শুরু।

পাকিস্তানি যুগে প্রথম যে আন্দোলনে বঙ্গবন্ধুসহ দেশপ্রেমিক বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য সম্পর্কে সোচ্চার হয়ে ওঠেন, তা হচ্ছে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন। বাংলাদেশের প্রথম প্রতিবাদ শুরু হয় ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে। ভাষা তথা মাতৃভাষার দাবি আদায় নিয়ে বিশ্বে প্রথম এই প্রতিবাদ। এই প্রতিবাদেও বঙ্গবন্ধু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন। বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে বাংলায় কথা বলার দাবি আদায় আমরা করেছিলাম। ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করার পেছনেও বঙ্গবন্ধুসহ বাঙালি অর্থনীতিবিদদের ভূমিকা কম ছিল না। সে সময়ে যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে সঠিক অর্থনৈতিক কর্মসূচি চিহ্নিত করে অন্তর্ভুক্ত করা, বিভিন্ন দেয়ালপত্রের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বৈষম্যের ব্যাপারটি আরও বড় করে তোলা এবং এ দেশের অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক বিকল্প কাঠামো চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে তদানীন্তন বাঙালি অর্থনীতিবিদসহ বঙ্গবন্ধুর অবদান ছিল অসামান্য। ষাটের দশকের প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধুসহ প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারলেন যে পাকিস্তানের দুই অংশের অর্থনীতির মধ্যে একটি মৌলিক পার্থক্য আছে, যার বেশির ভাগই কোনো অন্তর্নিহিত আপেক্ষিক দুর্বলতা থেকে উদ্ভূত নয়, বরং তা দীর্ঘদিনের বৈষম্যমূলক

নীতি অনুসরণের ফলাফল। তখন থেকে 'দুই অর্থনীতি তত্ত্বের' জন্ম, যার মূল কথা ছিল যে বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের অর্থনীতির মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান; দীর্ঘদিনের শোষণের ফলে পাকিস্তানি অর্থনীতি বর্ধিষ্ণু ও বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্ষয়িষ্ণু রূপ পরিগ্রহ করেছে এবং এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য এ দুটো অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ দুটো আলাদা সত্তা হিসেবে বিবেচনা করে তাদের জন্য পৃথক নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ আমরা পেলাম এক দেশ, দুই অর্থনীতি। শোষক আর শোষিতের অর্থনীতি। পাকিস্তান হলো শোষক, আমরা হলাম শোষিত।

প্রখ্যাত দেশপ্রেমিক বাঙালি অর্থনীতিবিদ প্রফেসর ড. নুরুল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমান বঙ্গবন্ধুর খুবই ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের চতুর্থ পঞ্চবার্ষিক (১৯৭০-৭৫) পরিকল্পনার ওপর পাকিস্তানের দুই অংশের বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদদের সমন্বয়ে যে বিশেষজ্ঞ পর্ষদ গঠিত হয়েছিল, তাতে বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা তাঁদের পাকিস্তানি প্রতিপক্ষের চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন এবং ফলস্বরূপ উন্নয়ন ও পরিকল্পনা বিষয়ে একটি একক প্রতিবেদনের পরিবর্তে তাঁরা তাঁদের একটি ভিন্ন নিজস্ব প্রতিবেদন তদানীন্তন কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পেশ করেন। বলা বাহুল্য, এই প্রতিবেদনে বাংলাদেশের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, বাংলাদেশকে শোষণ ও এর পরিপ্রেক্ষিতে করণীয় বিষয়সমূহই আলোচিত হয়েছিল। এ পৃথক প্রতিবেদনটি তৎকালীন পাকিস্তানি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতিমালার বিরুদ্ধে একটি অনন্যসাধারণ প্রতিবাদ হিসেবে বাঙালির ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে থাকবে, যা পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে আমাদের সাহস ও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে।

মূলত আইয়ুব খানের সামরিক শাসনকালে সাধারণ মানুষদের ওপর অত্যাচার ও আঞ্চলিক বৈষম্যের কথা সবাই জানলেও সংবাদপত্রগুলো তা নানা কারণে প্রকাশ করার সাহস রাখত না। সে সময় বাঙালি অর্থনীতিবিদসহ বঙ্গবন্ধু বিভিন্ন সভায় শাসকগোষ্ঠীর 'এক দেশ, দুই অর্থনীতি'র বিষয়ে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন। সে সময় প্রফেসর রেহমান সোবহান ছিলেন ২৬ বছরের একজন বিপ্লবী দেশপ্রেমিক তরুণ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক। তিনি সবেমাত্র ১৯৫৬ সালে কেমিব্রজ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছেন। তিনি সবসময় বাঙালির দাবি নিয়ে স্পষ্ট কথা বলতেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল, সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজনীতির মানুষজনকেও এই দ্বৈত অর্থনীতির বিষয়ে সচেতন করে তোলা, প্রতিবাদী করে তোলা। বিশেষ করে তখনকার দেশপ্রেমিক তরুণ ছাত্রসমাজকে শ্রেণিকক্ষে এবং শ্রেণিকক্ষের বাইরেও রাজনৈতিক দীক্ষা-শিক্ষা দিতেন এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত ও উজ্জীবিত করতেন। অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকট হওয়ার ফলে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আলাদা অর্থনীতির দাবিও ওঠে। ঠিক এই সময় প্রফেসর রেহমান সোবহান ১৯৬১ সালে পাকিস্তানের লাহোরে গিয়ে দুই অর্থনীতি তত্ত্বের ওপর একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করলেন। পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান পৃথক অর্থনীতির দাবিকে কঠোর ভাষায় নাকচ করে দিয়ে এক অভিন্ন অর্থনীতির কথা উচ্চারণ করেছিলেন। সে সময় পাকিস্তান অবজারভার পত্রিকায় শিরোনাম হয়েছিল, আইয়ুব বলছেন 'এক অর্থনীতি', একই সময়ে আরেকটি পত্রিকায় সংবাদের শিরোনাম ছিল, 'রেহমান বলছেন দুই অর্থনীতি'। পত্রিকায় এই পরস্পরবিরোধী সংবাদ প্রকাশিত হলে ঢাকা বিমানবন্দরে নেমে সাংবাদিকদের কাছে আইয়ুব খানের সরাসরি প্রশ্ন ছিল, 'এই রেহমান সোবহানটা আবার কে?'

ঠিক একই সময়ের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের কয়েকজন খ্যাতিমান অধ্যাপক আইয়ুব খানের সাথে সরাসরি কথা বলার আমন্ত্রণ পান। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল পূর্ব পাকিস্তানের

অনুন্নয়ন, আঞ্চলিক বৈষম্য ও তার সম্ভাব্য প্রতিকার। এই দলে ছিলেন ড. এম এন হুদা, ড. এফ এ হুসেইন, ড. আবদুল্লাহ ফারুক ও ড. নুরুল ইসলাম। দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি একটি লিখিত স্মারকলিপি দিতে বললেন। ১৯৬১ সালের জুন মাসে সেই স্মারকলিপিটি তাঁর কাছে পেশ করা হয়। এই স্মারকলিপির সুপারিশ দ্রুতই হিমাগারে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং তা আর আলোর মুখ দেখেনি।

বঙ্গবন্ধুর অর্থনৈতিক দর্শনের মূলে ছিল পাকিস্তানে বিদ্যমান 'দুই অর্থনীতির তত্ত্ব'। তদানীন্তন পাকিস্তানের দুই অংশের রাজনৈতিক বাস্তবতা এবং তার ফলস্বরূপ দুই অংশের অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে দুই অর্থনীতির তত্ত্বকে সামনে নিয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। পরবর্তী সময়ে এর ভিত্তিতেই গড়ে তোলেন ছয় দফা কর্মসূচি। তিনি অনুভব করেছিলেন, পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে এতটা পার্থক্য যে এর ফলে দুই অংশের মধ্যে পুঁজি ও শ্রমের সহজ চলাচল সম্ভব নয়। আর এ দুই অংশের জন্য এক অর্থনীতি কাজ করতে পারে না। তিনি প্রশাসনে কাজ করতে গিয়ে দেখেছেন শোষণটা কীভাবে হয়। তাই তিনি বলেছিলেন, দুই অর্থনীতি এভাবে একত্রে চলতে পারে না। সে জন্যই ৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৬ সালে লাহোরে বিরোধী দলের সম্মেলনে শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ছয় দফা দাবি পেশ করেছিলেন। বাঙালির ইতিহাসে লাহোর একটি ঐতিহাসিক স্থান। ১৯৪০ সালে এই লাহোরে শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক 'লাহোর প্রস্তাব' উত্থাপন করেছিলেন। ১৯৬১ সালে এই লাহোরে প্রফেসর রেহমান সোবহান দুই অর্থনীতির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। আবার এই লাহোরেই বঙ্গবন্ধু বাঙালির মুক্তিসনদ উপহার দিলেন। বঙ্গবন্ধু মনে-প্রাণে চেয়েছিলেন স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাই ছয় দফাকে বলা হয় বাংলাদেশের স্বাধীনতার সাঁকো।

ঐতিহাসক ছয় দফার মধ্যে একটি ছিল ফেডারেল স্টেট অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার গঠিত হবে। প্রাদেশিক সরকারকে ক্ষমতায়ন করা হবে। অর্থনৈতিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে। কর আহরণে প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্ব থাকবে। প্রাদেশিক সরকার যতটুকু অংশ কেন্দ্রীয় সরকারকে দেবে সেটি দিয়েই তাকে চলতে হবে। প্রদেশের আলাদা বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনা থাকবে। দুই প্রদেশের আলাদা কেন্দ্রীয় ব্যাংক সম্ভব না হলেও তারা আলাদাভাবে পরিচালিত হবে। প্রদেশের নিজস্ব মিলিশিয়া অথবা প্যারামিলিটারি বাহিনী থাকবে। বঙ্গবন্ধু ছিলেন মূলত একজন রাজনীতিবিদ, অর্থনীতিবিদ নন। তবু তিনিই প্রথম পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অর্থনীতির প্রস্তাবনা হাজির করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যে ১৫০০ মাইলের ব্যবধান তা ভৌগলিক সত্য। কাজেই এই দুই অঞ্চলের জন্য দুটি আলাদা অর্থনীতির কোনো বিকল্প নেই।" এভাবে তিনি ছয় দফার মাধ্যমে স্বাধীনতার সাঁকো তৈরি করলেন।

একদিকে চলছে মাঠে-ময়দানে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রাজনীতির লড়াই। নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে 'ফোরাম'-এ ছাপা হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনা নিয়ে শাণিত সব প্রতিবেদন ও প্রবন্ধ। ফোরামে যাঁরা লিখতেন, তাঁরা হলেন ড. অমর্ত্য সেন, ড. নুরুল ইসলাম, ড. আনিসুর রহমান, ড. আখলাকুর রহমান, ড. এ আর খান, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, কে জি মুস্তাফা। ফোরামের আজীবন গ্রাহক হলেন স্বয়ং বঙ্গবন্ধু। ১৯৬৯ সালের ২২ নভেম্বর রমনার সবুজ চত্বরে ফোরামের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়ে। ওই অনুষ্ঠানে বঙ্গবন্ধু ১০০০ টাকা দিয়ে ফোরামের আজীবন গ্রাহক হন।

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে একটা সংবিধান তৈরি করা। এতদিন যা ছিল দাবি, এখন

তা হয়ে দাঁড়ায় দায়িত্ব। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামানকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটা অনানুষ্ঠানিক হাইকমান্ড ছিল। বঙ্গবন্ধু তাঁদের নিয়ে বারবার বৈঠক করেন। কিন্তু সংবিধান তৈরির জন্য দরকার বিশেষজ্ঞের। বঙ্গবন্ধু এই কাজে তাঁর দেশপ্রেমিক, পরীক্ষিত, নিবেদিতপ্রাণ সহযোগীদের একত্রিত করলেন, যাঁরা এতদিন বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্রন্টে স্বাধিকারের জন্য লড়াই করে আসছিলেন। বিশেষজ্ঞদের মধ্যে ছিলেন ড. নুরুল ইসলাম, ড. মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, ড. খান সরোয়ার মুরশিদ, ড. আনিসুর রহমান, ড. কামাল হোসেন এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান। একাত্তরের উথাল-পাতাল দিনগুলোতে লোকচক্ষুর আড়ালে চলত তাঁদের আলোচনা। তাঁরা খসড়া সংবিধান তৈরি করে বঙ্গবন্ধুকে দেখাতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপ দর-কষাকষির জন্য একটা খসড়া সংবিধান তৈরির কাজটা বঙ্গবন্ধু মুজিব আগেভাগেই করে রাখলেন।

২৫ মার্চ রাতে গণহত্যা শুরু হওয়ার সাথে সাথে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা হওয়ার সামান্য পরেই বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করা হয়। শুরু হয় বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ। মুক্তিযুদ্ধকে খুব কাছে থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন তাজউদ্দীন আহমদসহ প্রখ্যাত বাঙালি অর্থনীতিবিদেরা। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে দ্বৈত অর্থনীতির বিরুদ্ধে লেখালেখির কারণে তাঁদের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়। তাই খুব দ্রুতই তাঁরা দেশ ছেড়ে ভারতের পথে রওনা হয়ে যান। অনেক প্রতিকূলতা পেরিয়ে দিল্লী পৌঁছালে আওয়ামী লীগ নেতা তাজউদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, অধ্যাপক রেহমান সোবহান, ভারতের প্রথিতযশা অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন, অর্জন সেনগুপ্ত, অশোক মিত্রসহ শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে প্রফেসর নুরুল ইসলামের সাথে দেখা হয়। হার্ভার্ডে তাঁর সতীর্থ পি. এন. ধরের সাথেও সে সময় সংযোগ ঘটে। প্রফেসর নুরুল ইসলাম এবং প্রফেসর রেহমান সোবহান পি. এন. হাকসারের সাথেও দেখা করে তাঁকে ঢাকায় যে গণহত্যা ও নির্যাতন চলছে, তার বিস্তারিত বিবরণ দেন। তাঁরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ভারতের সর্বাত্মক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পরে তাজউদ্দীন আহমদের পরামর্শমতো প্রফেসর নুরুল ইসলাম ও প্রফেসর রেহমান সোবহান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে এবং এপ্রিলের শেষের দিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং সেখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমর্থন আদায়ের পাশাপাশি প্রবাসী বাঙালিদেরও সংগঠিত করেন।

স্বাধীনতার পরপরই তাই বঙ্গবন্ধু ও তাঁর সহযোদ্ধারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আমাদের ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়ন করতে হবে। লক্ষ্য অর্জনে তাঁরা অন্যতম প্রধান যে কাজটি করেছিলেন, সেটি হলো বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ৩১ জানুয়ারি এই কমিশন গঠন করেন। এর লক্ষ্য ছিল একটি পরিকল্পিত রাষ্ট্র গঠন। বঙ্গবন্ধুসহ তাঁর সহযোদ্ধাদের চিন্তায় সমসাময়িক অর্থনৈতিক ভাবনা চিরজাগরূক ছিল। সমাজতন্ত্র অর্থে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা, পীড়াদায়ক বৈষম্য-শোষণ রোধ এবং অভ্যন্তরীণ লুণ্ঠন আইনের মাধ্যমে পরিহার করা। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে যাঁরা পরিচিত ছিলেন, বঙ্গবন্ধু যাঁদের চিনতেন এবং দুই অর্থনীতির তত্ত্ব ও ছয় দফায় যাঁদের ভূমিকা ছিল তাঁদেরই কয়েকজনকে নিয়ে তিনি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন। প্রফেসর ড. নুরুল ইসলামকে ডেপুটি চেয়ারম্যান পূর্ণ মন্ত্রীর পদমর্যাদাসহ, প্রফেসর ড. মোশাররফ হোসেন, প্রফেসর রেহমান সোবহান, প্রফেসর ড. আনিসুর রহমানকে সদস্য তথা প্রতিমন্ত্রীর পদমর্যাদায় কমিশনে নিয়োগ দেন। পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য কমিশনকে পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি দিয়েছিলেন। অনেক তরুণ দেশপ্রেমিক নিবেদিতপ্রাণ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উজ্জীবিত অর্থনীতিবিদদেরও তখন কমিশনে নিয়োগ দেওয়া হয়েছিল।

সদ্যস্বাধীন দেশটির একটি অন্যতম প্রয়োজন ছিল এর অর্থনীতির জন্য একটি মধ্যমেয়াদি দিগ্‌দর্শন। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন গঠিত হয়। দেশবরেণ্য অর্থনীতিবিদ, বিশেষজ্ঞবৃন্দ ও একদল অত্যন্ত মেধাবী ও অঙ্গীকারবদ্ধ কর্মকর্তা এই কমিশনে যোগ দেন। এ সংগঠনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে একটি বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হয় এবং এ কমিশনের ওপরই দায়িত্ব বর্তায় বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের। এটা অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে তাঁরা প্রাপ্ত সম্মানের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা রেখে ১৯৭৩ সালেই বাংলাদেশের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮) প্রণয়ন করেন। রাষ্ট্রীয় সংবিধানের মতো এ পরিকল্পনা গ্রন্থটিও এ দেশের প্রধান অর্থনৈতিক দলিল। এ গ্রন্থে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে পরিকল্পিত অর্থনীতির গুরুত্বই শুধু তুলে ধরা হয়নি, বরং এ জাতীয় একটি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যে ধরনের একটি অঙ্গীকারবদ্ধ ও নিঃস্বার্থ রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ও প্রশাসনযন্ত্রের প্রয়োজন হবে, সেদিকেও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল। প্রফেসর নুরুল ইসলাম কর্তৃক লিখিত এ পরিকল্পনা দলিলের ভূমিকাটি একটি অনন্যসাধারণ রচনা, যা আজও এ দেশে অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও অর্থবহ।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সময়সীমা ১৯৭৮ সালে শেষ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় তার আগেই বঙ্গবন্ধুকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ার সুবিশাল কর্মযজ্ঞে বড় ধরনের কুঠারাঘাত এল। যেসব নিবেতিপ্রাণ উজ্জীবিত ব্যক্তি কমিশনে সংযুক্ত হয়েছিলেন তাঁরাও কমিশন ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন।

নতুন শাসক যারা এলেন, তারা যেমন বাংলাদেশকে হত্যা করল, তেমনিভাবে স্বাধীন পরিকল্পনা কমিশনকেও হত্যা করল। হয়তো প্রাতিষ্ঠানিকভাবে হত্যা করল না, কিন্তু অযত্নে-অবহেলায় সংস্থাটিকে এক পাশে ফেলে রেখে দিলো। ফলে কমিশন ধীরে ধীরে গুরুত্ব হারাল। পর্যায়ক্রমে প্রতিপক্ষ শাসকগোষ্ঠী পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা থেকেও সরে এলো। শক্তিশালী বৈশ্বিক গোষ্ঠী সংস্থার (বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ) পরামর্শে তারা সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতির দিকে পা ফেলতে শুরু করল। 'দাতাদের' পরামর্শে কাঠামোগত সংস্কার কর্মসূচি গ্রহণ করল। প্রাসঙ্গিকভাবে নতুনত্বের কিছু চমকও দেখা গেল। 'অর্থ কোনো সমস্যা নয়' এ ধরনের চমক নতুন শাসকগোষ্ঠী ছড়াতে লাগলেন। নতুন শাসকগোষ্ঠী এসেই রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতি করাটা কঠিন করে তুললেন। কিন্তু অচিরেই এর অন্তর্নিহিত নেতিবাচক চরিত্র (প্রাতিষ্ঠানিক লুণ্ঠন, বিরাজনীতিকরণ ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতি) প্রকাশ পেতে শুরু করল। ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত টানা দুই দশক স্বাধীনতাকেন্দ্রীক সার্বিক কল্যাণমূলক উন্নয়নের আকাঙ্খা রুদ্ধ হলো।

১৯৯৬ সালে জনগণের ভোটে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ক্ষমতায় এল। শেখ হাসিনা আবার পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ধারণা পুনরুজ্জীবিত করলেন। পরিকল্পনা কমিশনের কাজ চাঙ্গা হলো। তবে স্বাধীনভাবে নয়, সরকারের একটি অন্যতম মন্ত্রণালয় হিসেবে। পুরনো জঞ্জাল গুছিয়ে অর্থনীতি একটা পর্যায়ে পৌঁছাল। কিন্তু ২০০১ সালে আবার সূক্ষ্ম কুটচালের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তন হলো। গোটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পুরনো প্রতিক্রিয়াশীলতার দর্শন ফিরে এল। ২০০৫ সাল পর্যন্ত এভাবেই চলল। ২০০৬-২০০৮ সময়কাল সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক ব্যবস্থা নামে এক ধরণের অসংজ্ঞায়িত, অগণতান্ত্রিক শাসন চলল।

২০০৮ সালে জাতীয় নির্বাচনের আগে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা জাতিকে উপহার দিলেন 'দিন বদলের সনদ' তথা 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' এবং 'মধ্যম আয়ের দেশ'। এ লক্ষ্যে পুরো

জাতিকে স্বপ্ন দেখালেন এবং প্রণয়ন করলেন প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২০২১। বঙ্গবন্ধুর দেখানো পরিকল্পিত অর্থনীতির পথে হাঁটলেন। প্রণয়ন করলেন ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫) এবং সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০)। তাই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নের মহাসড়কে, উন্নয়নের রোলমডেল। বাংলাদেশ এখন অনেক দেশের জন্যই উদাহরণ। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) প্রণয়ন এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০২০-২০২৫) প্রণয়ন করা হয়েছে। এসব পরিকল্পনায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতিকে স্বপ্ন দেখাচ্ছেন ২০৩১ সালে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালে উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের। এমডিজি লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ এখন সারা পৃথিবীতে রোল মডেল। এসডিজি ২০৩০ লক্ষ্য অর্জনেও বর্তমান সরকার যথাযথ ও কার্যকরী পরিকল্পনা ও নীতি ইতিমধ্যে গ্রহণ করেছে। বিশ্বের নামীদামি বিভিন্ন সমীক্ষায় এবং গবেষণায় বলা হচ্ছে, আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে এশিয়ার তিনটি দেশ বিশ্ব অর্থনীতিতে প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ হবে এবং সে দেশগুলো হলো চীন, ভারত ও ইন্দোনেশিয়া। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশও এশিয়ার দেশ হিসেবে বিশ্ব অর্থনীতিতে আগামীতে শীর্ষস্থানে অবস্থান করবে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিয়েছে। এই সাহসী ও রাষ্ট্রনায়কোচিত সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের জন্য ঘুরে দাঁড়ানোর একটি টার্নিং পয়েন্ট। এই সাহসী ও দেশপ্রেমিক সিদ্ধান্ত নেন স্বয়ং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজে। এর ফলে আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১.৫ শতাংশ। খুলনাসহ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে উন্নয়নের এক নতুন জোয়ার শুরু হবে। দুর্নীতি সহনীয় পর্যায়ে নিয়ে আনতে পারলে আমাদের প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১ শতাংশ এবং কর্মক্ষেত্রে যদি নারী-পুরুষের সমতা নিয়ে আসা যায়, তাহলে প্রবৃদ্ধি বাড়বে ১.৫ শতাংশ। অর্থাৎ আগামীতে বাংলাদেশের প্রবৃদ্ধি হবে দুই ডিজিটের।

পরিশেষে বঙ্গবন্ধু তাঁর অর্থনৈতিক ভাবনায় মোটা দাগে দুটি বিষয় চেয়েছিলেন। প্রথমত, বাংলার দুখী মানুষ খেয়ে পরে বাঁচুক। দ্বিতীয়ত, বাঙালিরাই বাংলাদেশ শাসন করুক। স্ব-ভূমিতে চিরতরে বিদেশি শাসনের অবসান ঘটুক। তাঁর দুটি লক্ষ্যই প্রায় অর্জিত হয়েছে। আমাদের সমাজ ও অর্থনীতিকে আমরা একটা শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করাতে পেরেছি। এই শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ২০৪৬ সালে স্বাধীনতার হীরকজয়ন্তীতে বাংলাদেশকে 'উন্নত রাষ্ট্রে' পরিণত করা, ২০৭১ সালে স্বাধীনতার শতবর্ষে বাংলাদেশ হবে পৃথিবীর অন্যতম সেরা অর্থনৈতিক পরাশক্তি এবং ২১০০ সালে ব-দ্বীপ পরিকল্পনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মকে সব সুযোগ-সুবিধার দিক দিয়ে সুরক্ষিত করাই হলো মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার স্বপ্ন। স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী ও বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে আমাদের প্রত্যাশা এই যে, বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে স্বপ্ন আমাদের দেখাচ্ছেন, তা অবশ্যই আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব।

গ্রন্থপঞ্জি

নুরুল ইসলাম, 'ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি', প্রতিচিন্তা, ০৮ আগস্ট, ২০২১।

সেলিম জাহান, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৬।

প্রথম প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০১০-২০২১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

দ্বিতীয় প্রেক্ষিত পরিকল্পনা - ২০২১-২০৪১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আব্দুল বায়েস, 'জাদুকর শিক্ষক, মানবিক সমাজবিজ্ঞানী জন্মদিন', কালের কণ্ঠ, ১২ মার্চ, ২০১৭।

বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০২০, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

মাননীয় অর্থমন্ত্রীর সকল বাজেট বক্তৃতা, জাতীয় সংসদ (২০০৯-২০১০ থেকে ২০২০-২০২১)।

রূপকল্প- ২০২১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

রূপকল্প- ২০৪১, বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

আতিউর রহমান, অ্যান ওডেসি: প্রফেসর নুরুল ইসলামের আত্মজৈবনিক এক অবিস্মরণীয় সৃষ্টি, চ্যানেল আই অনলাইন, ০৬ নভেম্বর, ২০১৮।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধু ও তাঁর অর্থনৈতিক মুক্তি', সচিত্র বাংলাদেশ, আগস্ট, ২০১৬।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন ভাবনা এবং আগামী দিনের বাংলাদেশ', দৈনিক ইত্তেফাক, ০৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২০।

আতিউর রহমান, 'বঙ্গবন্ধুর জনকল্যাণের অর্থনীতি' প্রতিচিন্তা, ০৮ আগস্ট, ২০২১।

আনিসুর রহমান, পথে যা পেয়েছি (প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড), অ্যাডর্ন পাবলিকেশনস, ঢাকা।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১১-২০১৫, ২০১৬-২০২০, ২০২০-২০২৫), বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

এম এ মান্নান, 'জাতির জনক ও পরিকল্পনা কমিশন', বণিক বার্তা, ১৫ আগস্ট, ২০২০।

Islam, Nurul. Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale, Dhaka: UPL, 2003.

Islam, Nurul. An Odyssey: The Journey of My Life, Dhaka: Prothoma Prokashon, 2018.

Sobhan, Rehman. Untranquil Recollections: The Years of Fulfilment, New Delhi: Sage Publications India Pvt Ltd, 2016.

Sobhan, Rehman. From Two Economics to Two Nations: My Journey to Bangladesh, Dhaka: Daily Star Books, 2016.